সংবাদ

তারিখ : 18 OCT 2017 পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১

শিক্ষা বা শিক্ষা দিবসের স্বপ্ন কি বাস্তবায়নের পথে?

এ. এন. রাশেদা

মনে পড়ছে ১৯৬২ সালের কথা। পাকিস্তানি শাসক সামরিক জান্তা ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খানের দেয়া শরিফ কমিশনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম গর্জে উঠেছিল ছাত্রসমাজ। সে ছিল শিক্ষা সংকোচন নীতি। প্রাণ ঝরেছিল মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লাহসহ নাম না জানা অনেকের। তারই পথ ধরে ৬৬-র ৬-দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু জাতি কি ভুলে গেল '৬২-র সেই ছাত্র-আন্দোলনের কথা? না, সবাই ভুলেনি- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে দিবসটি পালিত হয়েছে- কিন্তু গণমাধ্যমসমূহ ছিল নীরব- পালনের তেমন কোন খবরই চোখে পড়ার মতো ছিল না। সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ-শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কথা না বলে বঙ্গবন্ধুর ক্যাসেট, সরকারের উন্নয়নের কথা বলেছে শিক্ষা ভবনের সামনে। দেশব্যাপী ছিল না কোন কর্মসূচি। অন্যান্য বাম রাজনীতির ধারার ছাত্র সংগঠন সর্বশক্তি দিয়ে দিবসটি পালন করলেও ২/১টি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ১-২ সেকেন্ডের জন্য একবারই সংবাদে এসেছে; প্রিন্ট মিডিয়াতেও সেই রূপ। ১৯৬২-র ১৭ সেপ্টেম্বরের কি কোনই গুরুত্ব নেই- সামরিক শাসনের জাঁতাকল থেকে দেশকে আন্দোলনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে? তাহলে কেন এই অবহেলা- এই দিবসের শহীদদের প্রতি? শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়েও তো 'শিক্ষা দিবস'-এর প্রতি সম্মান দেখানো যায়। অনেকেই বলছেন- অনেক উন্নয়ন হয়েছে- স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার গেছে। আইসিটি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সেখানেই তো প্রশ্ন- কম্পিউটারের সুফল শতকরা বা হাজারের হিসাবে কতজন শিক্ষার্থী ভোগ করতে পারছে? আইসিটির শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন কি? এমন হাজারো প্রশ্ন। কয়েকটির উদাহরণ দিয়ে উন্নয়নের প্রকৃত সত্য দেয়া যেতে পারে। ২৯-১২-২০১৬ দৈনিক সংবাদ প্রকাশ করছে 'লুটপাট স্বেচ্ছাচারিতা দুর্নীতি : অকার্যকর কারিগরি শিক্ষাবোর্ড'। ০৮-০১-২০১৭ কালের কণ্ঠ প্রকাশ করছে-ডাহা ভুলে চোখ বুজে নম্বর। জেএসসি পরীক্ষার খাতা দেখা শেষে নিজের নাম পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একজন শিক্ষক বললেন, অনেক প্রশ্নের উত্তরই ডাহা ভুল লিখেছে পরীক্ষার্থীরা। তাদের ফেল করার কথা। কিন্তু প্রধান পরীক্ষক বলে দিয়েছেন কাউকে ফেল করানো যাবে না। তাই উত্তর ভুল দিলেও নম্বর দিতে বাধ্য হয়েছি।' এতেই বোঝা যায় পাশের হার বৃদ্ধির কারণ।

২৪-০১-২০১৭ দৈনিক সংবাদের অনুসন্ধানী রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে : 'সৃজনশীল প্রশিক্ষণে গলদ ও অব্যবস্থাপনা : চার লাখ ৬৮ হাজার শিক্ষকের চার লাখেরও বেশি প্রশিক্ষণ পাননি। ফেরত যাচ্ছে ১০০ কোটি টাকা।' এতেই বোঝা যায় শিক্ষকরা কি পড়াচ্ছেন আর শিক্ষার্থীরা কি শিখছে? প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে একবার শিক্ষামন্ত্রী বললেন : কোন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় না। যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা বলবে- তাকেই গ্রেফতার করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত সত্য তথ্য হিসেবে ১৪-০৩-২০১৭ দৈনিক কালের কণ্ঠ শিরোনাম হিসেবে প্রকাশ করছে : 'আগের রাতে ট্রেজারি থেকেই প্রশ্ন ফাঁস'। তথ্যে বলা হেচ্ছ : পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় সাধারণত দুই সময়ে। পরীক্ষার আগের রাতে আর পরীক্ষার দিন সকালে।' অথচ মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি বলে শিক্ষামন্ত্রী গোঁট ধরে থাকলেন আর সেই নকলবাজ শিক্ষার্থীদের ভর্তির পর জানা গেছে সেই সব প্রতিষ্ঠানে তারা ক্লাসই করতে যাচ্ছে না বা পারছে না। অর্থাৎ তাদের সে যোগ্যতাই নেই। আবার ২৮-০৫-২০১৭ তারিখে দৈনিক সংবাদ রিপোর্ট করছে : '২০ হাজার টাকায় প্রশ্ন বিক্রি/ ৬ প্রশ্ন ফাঁসকারী গ্রেফতার/২০ জনকে খুঁজছে' ইত্যাদি। শিক্ষামন্ত্রী কি জবাব দেবেন? করবেন কি পদত্যাগ- অসত্য কথনের জন্য।

আবার দেখা যাচ্ছে- বিশ্ববিদ্যালয়েও একই কাহিনী- আরও উন্নতমানের। ২৩-০৪-২০১৭ তারিখের দৈনিক সংবাদে রিপোর্টের শিরোনাম হচ্ছে : '৪ থেকে ৫ লাখ টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। টাকা দিতে না পারায় এক ছাত্রকে অপহরণ।' খবরে বলা হচ্ছে যে, অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তাদের মার্কশিট, সার্টিফিকেট ও প্রবেশপত্রের মূলকপি সংগ্রহ করে। এরপর ছাত্রদের কাছ থেকে অনলাইনে ফরম পূরণের আইডেন্টিফিকেশন নম্বর সংগ্রহ করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে ফটোশপের মাধ্যমে প্রবেশপত্রের ছবি পরিবর্তন করে অন্য মেধাবী ছাত্রকে দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ায়। এর বিনিময়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের নিকট জনপ্রতি ৪,০০০০০/- টাকা থেকে ৫,০০,০০০/- টাকা আদায় করে থাকে। যদি কোনো ভর্তিপ্রার্থী টাকা দিতে অক্ষম হয়- তাহলে তারা সে ছাত্রকে অপহরণ এবং তার মূল মার্কশিট ও সার্টিফিকেট আটক করে বিকাশ, ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হতে বা হাতে হাতে টাকা আদায় করে।' এ সবই হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার সামান্যতম নমুনা। আবার একই পত্রিকার ০১-০৫-২০১৭ তারিখের শিরোনাম 'পরীক্ষার হলে নকল ঠেকাতে গিয়ে হামলার শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরা'। এর পূর্বে নিহতও হয়েছেন শিক্ষক।

২০১০ সালের শিক্ষানীতির সুপারিশবহির্ভূত যে-পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা চালু হয়েছে যা আবার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে বহাল রাখা হলো- তার কারণ তো হলো ঐ আর্থিক লেনদেনের- এক বিশাল বাণিজ্য। এই বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে আসা কি এত সহজ? তাই ১৮-০৫-২০১৭ তারিখে খবরের শিরোনাম হয়েছে, পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনীতেও ফলাফলে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ।' রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে জিপিএ-৫ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে রাজধানীর ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে গত কয়েক বছর ধরেই খুদে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছেমত নম্বর টেম্পারিং হয়ে আসছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।' এতে কী প্রতীয়মান হয়- শুধু শিক্ষকরাই অসাধু- যাদের মান মর্যাদা বেতন স্কেল সবই নিম্নস্তরের তারাই, না কি যাদের গাড়ি-বাড়ির নিশ্চয়তা দিয়ে পাহারাদার হিসাবে বসানো হয়েছে- তারাও অসাধু। কারণ এদের যোগসাজশ ছাড়া শিক্ষকরা অসাধু হতে পারে না। কারণ তারাই তো পাহারাদার।

২০১৭ সালে এসএসসিতে পাসের হার কমেছে। শিক্ষামন্ত্রী এবার নিজেকে বাঁচিয়ে বললেন, 'আগে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে শিক্ষকদের গাফিলতি ছিল।' কিন্তু আগে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পাসের হার বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের ওপর নির্দেশ ছিল তা তিনি অস্বীকার করলেও কালের বিচারে সত্যই প্রতিভাত হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নেই, লেখাপড়া ব্যাহত- এ সংক্রান্ত খবর প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। দৈনিক সমকাল ১০-০৭-২০১৭ তারিখে 'মদন সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৪৪ শিক্ষকের পদ শূন্য, লেখাপড়া ব্যাহত' শিরোনামে প্রকাশ করছে- মদন সরকারি হাজি আবদুল আজিজ খান ডিগ্রি কলেজের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, প্রাণিবিদ্যা, দর্শন, অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষকের পদসহ ৪৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তাছাড়া বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ থাকায় তারাও সঠিকভাবে পাঠদান করতে পারছে না। এ কলেজের ১৫টি বিষয়ে এইচএসসি ও ৯ বিষয়ে স্নাতক কোর্স চালু রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুই হাজার ৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে একজনও শিক্ষক না থাকায় ডিজিটাল যুগের শিক্ষার্থীরা এ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ চিত্র সারাদেশের সব সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আইসিটির ব্যবহার প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন বা প্রচার মাধ্যম যতই উন্নয়নের কথা বলুক- তা গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানের বেলায় প্রযোজ্য হয়ে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে; অথচ গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর সুফল নেই। ০৩-০৪-২০১৭ তারিখে প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের প্রায় ২৬ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হলেও এর বেশিরভাগই অব্যবহৃত রয়েছে। শিক্ষায় আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) বিকাশ শুধু শিক্ষা উপকরণ বিতরণেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু নেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ। শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আইসিটি উপকরণ অকেজো বা অকার্যকরও রয়েছে। তবে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়নে আইসিটি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে।'

এদিকে দেশের সব স্কুল ও কলেজে আইসিটি শিক্ষা উপকরণ না থাকলেও বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত শিক্ষা উপকরণও সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে এভাবে এলোমেলো শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে।

আরও কথা হলো ২০১২ সাল থেকে ৬ষ্ঠ-একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আইসিটি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হলেও স্থায়ী শিক্ষক নেই। তাই শিক্ষকের বেতনও নেই। এ যাবৎ প্রতিষ্ঠান প্রতি একজন করে সারাদেশে ১১ হাজার ৭৮৯ জন শিক্ষক এ সুবিধা পাচ্ছেন। কম্পিউটার অপারেটর দিয়ে আইসিটি বিষয় পাঠদান চলে। অনুসন্ধানী রিপোর্ট বলছে : 'কার্যত আইসিটি শিক্ষার বিকাশে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের জোরাল কোন পদক্ষেপ নেই। কিন্তু নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের ব্যাপক তোড়জোড় সবসময় চলমান। এতে এক শ্রেণীর কর্মকর্তার অনৈতিক সুবিধা বাড়তে থাকলেও এ শিক্ষার মৌলিক গুণগত উন্নয়ন হচ্ছে না বলেও শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন'। এসবই হচ্ছে আইসিটি নিয়ে সরকারি বাগড়ম্বর প্রচারণার নেপথ্য সংবাদ।

১৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংবাদ প্রথম পাতায় শিরোনাম হিসেবে প্রকাশ করছে : 'দুদক ও আইএমইডি'র পরামর্শে শিক্ষার মানোন্নয়নে ৫ প্রকল্পের কার্যক্রমে তদন্ত হচ্ছে'। 'দুর্নীতি, অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার ও অগ্রগতি কম হওয়ায় শিক্ষার মনোন্নয়নের পাঁচটি প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' (আইএমইডি)। প্রকল্পগুলো হলো- সেসিপ, এসইএসপি, টিকিউআই, জেনারেশন ব্রেক থ্রু প্রকল্প ও এনএএএনডি।' এখানেই তো প্রশ্ন যে সব প্রকল্পের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করার কথা তারা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়; তাহলে উন্নয়ন হবে কিভাবে?

আরও দুঃজনক হলো- শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা যেখানে ধুলায় লুণ্ঠিত অপ্রতুল বেতনভাতাদি দ্বারা শিক্ষকদের ন্যায্য অবসরকালীন সুবিধা যেখানে যুগ যুগ ধরে ঝুলে থাকে এমন কি মৃত্যুর পর পর্যন্ত- অথচ সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতায় বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের হাজার কোটি টাকা ফেরত যায়- আর আমাদের দেখতে হয় শিক্ষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা। এ-দেশে শুধু কি শিক্ষক অবহেলিত, তা তো না- শিক্ষা ও শিক্ষার্থীও অবহেলিত। তা না হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৩ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য থাকে কি করে? ২১ হাজার প্রধান শিক্ষকের এবং ৩২ হাজার সহকারী শিক্ষকের। আর মাউশির মাধ্যমিক শাখার তথ্যমতে ৩৩৩টি বিদ্যালয়ে ১০ হাজার ২৪৩টি সহকারী শিক্ষকের পদের এক হাজার ৮১৫টি শূন্য। অন্যদিকে সহকারী-প্রধান শিক্ষকের ৪৬২টি পদের মধ্যে সবকটিই শূন্য। তাহলে এ শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলে কিভাবে? আর এ নিয়ে গর্ব করারই বা কি আছে? এই তো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষুদ্র একখণ্ড চিত্র। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা নেই, মন্ত্রণালয়ে মানুষ নেই- আছে শিক্ষকদের চাইতে অতি উচ্চহারে বেতনভুক্ত সুযোগ-সুবিধাভোগী, লোভী, দুর্নীতিবাজ ডিগ্রিধারী এক শ্রেণী। দু-একজন সৎ মানুষ কোণঠাসা, নয়তবা মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত।

আরও একটি কথা- বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন কি- সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চেয়েছিল? আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই দোষে দুষ্ট। এবং বর্তমানে হেফাজতে ইসলাম সেই কাজটি করেছিল তা সবার জানা আছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তো কোন ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। শিক্ষার থাকতে হবে সাহিত্যমূল্য, ভাষামূল্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি আর তার ধারাবাহিকতা। শিক্ষা কখনোই একটি কাল নির্ভর হতে পারে না।

১৯৬২ থেকে ২০১৭। এই ৫৪ বছর পর বলতে হচ্ছে : মোস্তফা, বাবুল ওয়াজিউল্লাহ- তোমাদের আত্মদান 'বর্তমান সময়' বিস্মৃত। তোমাদের ঋণ আমরা পরিশোধ করতে পারছি না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরও। দেশ আজ ধনিক শ্রেণির আজ্ঞাবহ। ২২ পরিবারের স্থলে ২২ হাজার পরিবারের হাতে দেশের সম্পদ কুক্ষিগত। প্রকৃতি পরিবেশ আজ এদের হাতে জিম্মি। মানুষের কাছে মানুষের পরাজয়- যেমন, অপরিকল্পিত বালু উত্তোলনে হাজার হাজার মানুষ জমিহারা, গৃহহারা হচ্ছে; সরকারি প্রশাসনের দুর্নীতির কারণে হাওর অঞ্চলের মানুষ আজ দিশেহারা। জাল যার, জলা তার না; ইত্যাদি লাখো সমস্যা- সমাজে শিক্ষার কোনো ললিত বাণী শোনাতে পারছে না। বৈধ ও অবৈধভাবে শিক্ষার সার্টিফিকেটধারীদের হাতে দেশ আজ জিম্মি।

[লেখক : সাবেক অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, নটর ডেম কলেজ, সম্পাদক শিক্ষাবার্তা]